যায়যায়দিন

তারিখ ... 5 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

প্রতিবন্ধী শিশুরা এবং তাদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা

শাম্মা তাবাসসুম

বলা হয়ে থাকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা। তবে শিক্ষা বর্তমানে শুধু মানুষের মৌলিক অধিকারই নয়, এটি মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়নেরও পুঁজি। শিক্ষার প্রসার ছাড়া কোন দেশ বা জাতির পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষার অধিকার থেকে আমরা কাউকেই বঞ্চিত করতে পারি না। অথচ আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি বড় অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্যগত (শারীরিক বা মানসিক) প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশু রয়েছে সমাজে, তাদের আমরা প্রতিবন্ধী বলে থাকি। এসব শিশু আমাদের পরিবার, সমাজ বা দেশের বাইরের কেউ নয়।

অথচ এদের সঠিক কোন সংখ্যা যেমন সরকারি কাগজপত্রে নেই তেমনি নেই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা দিকনির্দেশনা। যদিও এবারের বাজেটে মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যেকোন দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১০ ভাগ লোক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি ৫০ লাখ লোক প্রতিবন্ধী যার মধ্যে প্রায় ২৬ লাখ হলো শিশু। এই প্রতিবন্ধী শিশুদের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ স্কুলে যায়।

প্রতিবন্ধী-সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা গৃহীত হয় ১৯৯৫ সালে– এটি ছিল সর্বপ্রথম দাপ্তরিক পদক্ষেপ। এ নীতিমালা কার্যকর করতে ২০০৬ সালে সংসদে একটি জাতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০১ সালে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন কার্যকর করা হলে ১৯৯৫ সালে গৃহীত নীতিমালা যথাযথ আইনগত সহায়তার গণ্ডিতে আসে। এছাড়াও ২০০৭ সালে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার-সংক্রান্ত চুক্তিমালায় বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাগজে-কলমে বা নীতিনির্ধারণের দিক থেকে সরকার খুব পিছিয়ে নেই। কিন্তু পরিকল্পনা বা নীতিমালার বাস্তবায়নে সরকার কতটা উদগ্রীব?

সাধারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের আওতায় সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধীদের পাঁচ প্রকার সমস্যা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে– মানসিক বিকলাঙ্গতা, স্নায়বিক বিকলাঙ্গতা, মূক ও বধিরতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা এবং অটিজম (Autism)। এ সব প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার দিকটি অত্যন্ত অবহেলিত ও সীমিত। সমস্যাবলির একটি সার্বিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে–

* প্রায় সব ক্ষেত্রে অজ্ঞতা আর কুসংস্কার প্রতিবন্ধী শিশুদের বেড়ে ওঠা ও শিক্ষা-দীক্ষার পথে প্রধানতম বাধা।

* প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত সব বিষয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়ও এ মন্ত্রণালয়ের অধীন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন না হওয়ায় মূল কাঠামোগত শিক্ষার আওতায় এদের আনা যাচ্ছে না।

* প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক এবং শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নেই। সহায়ক স্যানিটেশন, প্রয়োজনীয় আসবাব, ব্রেইলি, শ্রবণ যন্ত্র– এসব কিছুরই প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

* শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষায় ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক ভাষার মাধ্যম মূলত ইংরেজি। বাংলা মাধ্যমে এরূপ সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার খুব নতুন। ফলে এটি তাদের ভাব আদান-প্রদানে সম্পূর্ণ সহায়ক এখনও হয়ে উঠেনি।

* সর্বোপরি রয়েছে একটি প্রতিবন্ধী সহায়ক পাঠ্যসূচির অভাব। বেসরকারি সংস্থাগুলোও একক কোন পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে না।

সরকারি সহায়তায় পরিচালিত প্রতিবন্ধী স্কুলের সংখ্যা মাত্র ১৩টি, যা একেবারেই যথেষ্টসংখ্যক নয় এবং এ স্কুলগুলো শুধু বধির, অন্ধ ও মানসিক বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য। প্রায় ২৬ লাখ প্রতিবন্ধী শিশুর মধ্যে মাত্র এক হাজার ৫০০ শিশু সরকারি সাহায্যাধীন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বলা যায়, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা মূলত এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। প্রায় ৪০০ এনজিও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে থাকে। এনজিওগুলো ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার প্রতিবন্ধী শিশু নিয়ে কাজ করে থাকে। এটিও মোট প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যার একটি নগণ্য অংশ। অন্যদিকে, বেসরকারি সংস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বাংলাদেশের মোট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশই অশিক্ষিত। এর পেছনে কতগুলো কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মের হার দরিদ্রদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি। এসব পরিবারের অভিভাবকরা নিজেরাই অক্ষরজ্ঞানহীন। (চলবে)